Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.3
Pages	63-84
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

ভাব ও ইন্দ্রিয়জগৎ সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা

এথেন্সের সোলন্ (Solon), প্রিয়েনের বিয়স্ (Bias), কোরিন্থের পেরিয়ান্দার্ (Periander), মিলেটাসের থেলিস্ (Thales), লেসিডিমনের চিলন্ (Chilon), লেস্বসের পিথেকিউস্ (Pithacus) এবং লিন্দসের ক্লিওবুলস্, জ্ঞানের সপ্তর্ষি বলে খ্যাত এই সব পণ্ডিত ও তাদের শিষ্যদের চেষ্টায় ইউনানি দর্শনের উৎকর্ষ সাধন হবার পূর্বে গ্রীকরা ভাব ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে হিন্দুদের মতই ধারণা পোষণ করত। কেউ কেউ বিশ্বাস করত সমস্ত বস্তুজগৎ-ই এক। এই জগতের মূলে এক প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে বলে কারো কারো ধারণা ছিল। আবার কেউ বিশ্বাস করত যে এর মূলে আছে এক পরম শক্তি। মানুষ প্রস্তর বা অনুরূপ জড় পদার্থের তুলনায় এই মূল সত্তার নিকটতর বলেই তার মর্যাদা, নচেৎ মানুষ ও জড় পদার্থে কোন প্রভেদ নাই। আবার কারোর মতে, অস্তিত্ব একমাত্র এই আদি কারণেরই আছে, কারণ সে স্বয়ম্ভু, অন্যান্য বস্তুর মত তার কোনও কারণ নাই। যার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল, তার অস্তিত্ব সত্য নয়, কল্পনা মাত্র। প্রকৃত অস্তিত্ব একমাত্র সেই এক ও আদি সত্তার।

শেষোক্ত মতটি ইউনানি Sophistদের। এরা দার্শনিক। ইউনানি ভাষায় Soph শব্দের অর্থ বোধি। দার্শনিককে তাই ইউনানি ভাষায় পিলসোপা (پيلا سوپا) বলা হয়, অর্থাৎ বোধি যার প্রিয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা এদের নিকটবর্তী মতামত অবলম্বন করল, তারাও ঐ নামে অভিহিত হতে লাগল। অনেকে শব্দটির আসল তাৎপর্য না বুঝে, তাকে আরবী সুফ্‌ফা (الصفة) শব্দের সাথে সম্পর্কিত মনে করেছে। 'সুফ্‌ফা' শব্দটি আসলে রসুলুল্লাহ্‌র সহচরদের প্রতিই প্রযোজ্য

হবার কথা। শব্দটির উচ্চারণে ও বানানে আরও বিকৃতি ঘটে অবশেষে এমন দাঁড়াল যে তাকে 'সুফ্' শব্দ (যার অর্থ ভেড়ার লোম) থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতে লাগল। একটি কবিতায় বস্‌তের আবুল ফাতাহ্ এইরূপ ভ্রান্তি এড়াবার সার্থক চেষ্টা করেছেন:

> সুফী শব্দের তাৎপর্য নিয়ে লোকেরা কলহ করেছে বহুকাল ধরে। তারা ভেবেছে 'সুফ্' থেকে শব্দটি উদ্ভূত। আমি কিন্তু এই শব্দটির অর্থে পূতচরিত্র (صافی) যুবক-ই বুঝি। এই 'সাফি' থেকে 'সুফী', এবং সেজন্যই নির্মল স্বভাব সাধকরাও 'সুফী'।

ইউনানিরা আরও মনে করত যে বস্তুজগৎ মাত্র একটি, যার মধ্যে নানা আকারে ও নানা রূপে 'আদি কারণ' (first cause) নিজকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন বস্তুরূপের মধ্যে সেই আদি কারণের-ই শক্তি বিভিন্ন অবস্থায় ক্রিয়াশীল; অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্বেও এই অবস্থার পার্থক্যের দরুন-ই তাদের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইউনানিদের মধ্যে আরও একদল ছিল যারা বিশ্বাস করত যে কায়মনোবাক্যে যে এই আদি কারণের প্রতি নিবিষ্ট হয়, এবং সাধ্যমত তার মত হবার সাধনা করে,সে সমস্ত মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে, ও সমস্ত ভয় বাধামুক্ত হয়ে তার সাথে মিলিত হয়। সুফীদের লক্ষ্যও এই রকম বলে তারাও এইরূপ মত পোষণ করে।

আত্মা ও অশরীরী জীব সম্বন্ধে ইউনানিদের বিশ্বাস ছিল যে কায়া পরিগ্রহণের পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব থাকে; তাদের সংখ্যা ও শ্রেণীগত সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব, পরিচয় ও অপরিচয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধও তাদের মধ্যে আছে এবং শরীরী অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত কর্মদ্বারা তাদের দেহত্যাগের পরের নির্দ্ধারিত অবস্থা তারা অর্জন করে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে দৃশ্যজগৎকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করে। এই জন্য ইউনানিরা তাদেরকে দেবতা নাম দিত, এবং তাদের নামে মূর্তি নির্মাণ করে নানা অর্ঘ্য দিয়ে তাদের পূজা করত। যেমন Galenus তাঁর "শিল্পশিক্ষা প্রেরণা" নামক পুস্তকে লিখেছেন: যে সব মহাপুরুষ ঠাকুর-দেবতার মধ্যে পরিগণিত হবার সম্মান অর্জন করেছেন, শিল্প-কলার চর্চায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলেই তাঁদের সে সম্মান—শারীরিক বলপ্রয়োগ, কুস্তি বা discus নিক্ষেপে কৃতিত্বের জন্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Ascelpius ও Dionysiusএর নাম করা চলে। দেবত্বে উন্নীত মানব বা প্রকৃত দেবতা অতীতে এঁরা যাই থেকে থাকুন, এঁরা যে বিপুল শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন তা এইজন্য

যে এঁদের একজন মানুষকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়েছিলেন, আর অপরজন শিখিয়েছিলেন দ্রাক্ষার চাষ।"

Hippocratesএর সূত্রের টীকায় Galenus আরও বলেছেন: "Asclepiusএর মন্দিরে ছাগল অর্ঘ্য দেওয়ার কথা আমি কখনও শুনিনি, কেননা ছাগলের লোম বোনা সহজ নয় আর ছাগলের প্রকৃতির দোষে অতিরিক্ত ছাগমাংস ভক্ষণে মৃগিরোগ জন্মায়। লোকে আসলে Asclepiusকে কুক্কুট অর্ঘ্য দেয়। Hippocratesও তাই করতেন, কারণ এই দেবোপম পুরুষ মানুষকে চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়েছিলেন যা Dionysius ও Demeterএর আবিষ্কৃত দ্রাক্ষারস ও শস্যবীজের জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামেই শস্য বীজের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে।"

Plato তাঁর Timæus নামক গ্রন্থে বলেছেন: "ত্বক ছেদনকারী বর্বর জাতিরা (সেমিটি জাতি) 'তী' (Dei) নামক যে সব অশরীরী জীবকে অমর বলে বা ভগবান আখ্যা দেয়, আসলে তারা দেবজাত (angels): সত্য ভগবানকে তারা প্রধান বা আদি ঈশ্বর বলে থাকে।"

তিনি আরও বলছেন, "ঈশ্বর দেবগণকে বললেন: অমর হবার নিজস্ব ক্ষমতা তোমাদের নাই, তবে তোমাদের মৃত্যু হবে না, কারণ তোমাদের সৃষ্টির সময়েই তোমরা এই মর্মে আমার নিকট থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করেছ।"

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র Plato লিখছেন: "ঈশ্বর একবচনীয় শব্দ: ঈশ্বরের বহুবচন হয় না।"

এসব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউনানিদের মধ্যে ভগবান শব্দটি ব্যাপক অর্থে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বস্তুমাত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে; আরো অনেক জাতির মধ্যেও শব্দটির এইরূপ প্রয়োগরীতি দেখা যায়, যারা পর্বত সমুদ্র প্রভৃতিকেও ভগবান আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর বিশেষ অর্থে শব্দটি ওরা 'আদিকারণ' (first cause), দেবদূত ও তাদের আত্মার জন্য ব্যবহার করে। আর এক অর্থে Plato ভগবানের Sekinat নাম দিয়েছেন। এই Sekinat শব্দটির পূর্ণ ব্যাখ্যা কোনও টীকাকারের লেখাতেই পাওয়া যায় না, সেজন্য আমরা শব্দটির ব্যবহারই পাচ্ছি, আসল অর্থ পাই না।

বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johannes Grammaticus) Proclusএর মত খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন: "আকাশমণ্ডলীর দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে ইউনানিরা

ভগবান আখ্যা দিত, যেমন গ্রীকেতর (আজমী) জাতিদের অনেকেই করে থাকে। তারপরে, ভাবজগতের মৌলিক তত্ত্ব নিয়ে যখন তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করল, তখন সেই মূলতত্ত্বকেই তারা ঈশ্বর নাম দিল।"

অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্ত পৌঁছতে হয় যে ঈশ্বরত্বে উন্নীত হওয়ার অর্থ হোল (আমাদের) ফেরেস্তার পর্যায়ভুক্ত হওয়া। একথা Galenus তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "একথা যদি সত্য হয় যে Asclepius পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং অবশেষে ঈশ্বর তাঁকে ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা দিলেন, তাহলে অন্যরকমের সব কথাই বাতুলের প্রলাপ।" অন্যত্রও Galenus বলেছেন: ঈশ্বর Lycurgusকে বল্লেন: "তোমাকে মানব না দেবতা বল্‌ব, তা নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত, তবে শেষের নামটিরই আমি পক্ষপাতি।"

কতকগুলি এমন শব্দ ও বাক্য আছে যা কোনও কোনও ধর্মে আপত্তিকর আবার কোনও কোনও ধর্মে অনুমোদিত, যা কোনও ভাষায় গ্রহণযোগ্য আবার কোনও ভাষায় বর্জনীয়। ('তা-আল্লাহ্') দেবত্বারোপ এইরূপ একটি শব্দ যা মুসলমানদের কাছে অতিশয় নিন্দনীয়। আরবী ভাষায় আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যেসব নামে অভিহিত করা হয় তার মধ্যে একমাত্র 'আল্লাহ' ব্যতীত অন্যসব নাম-ই কোন না কোন ভাবে অন্য জীবেও আরোপ করা চলে; কেবল 'আল্লাহ্' শব্দ একমাত্র ঈশ্বরেই প্রযোজ্য। এইটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।

কোরানের পূর্বে যে হিব্রু ও সিরীয় ভাষাতে ঐশ্বরিক গ্রন্থ প্রেরিত হয়েছিল সে ভাষাদুটি বিবেচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে Torah এবং তৎপরবর্তী গ্রন্থসমূহে (যা Torah-রই অংশ বলে গণ্য হয়) 'রব্‌ব্' (অর্থাৎ 'স্বামী') শব্দটি আরবী 'আল্লাহ্' শব্দের সমার্থবাচক শব্দ রূপেই ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আরবী ভাষায় এই 'রব্‌ব্' শব্দটি কোনও বস্তুর সঙ্গে বিশেষণ রূপে যেমন ব্যবহার হতে পারে, হিব্রু বা সিরীয় ভাষায় তেমন হয়না; 'গৃহের রব্‌ব্' বা 'ধনের রব্‌ব্' ইত্যাদি ঐ দুই ভাষায় বলা চলে না। অথচ ঐ দুই ভাষাতেই "এলাহ" (= Eloah = ঈশ্বর) শব্দের ব্যবহার আরবীতে 'রবেব্'র মত বস্তু-সম্পর্কিত বিশেষ্য হতে বাধা নাই।

এই Torah গ্রন্থেই আছে: মহাপ্লাবনের পূর্ব্বে "এলোহিমের পুত্ররা মানব কন্যা সমূহে উপগত হোল। "Elohimএর পুত্রদের সঙ্গে শয়তান তাদের

সভায় প্রবেশ করল।" এই উক্তি Book of Jobএ পাওয়া যায়। Torah গ্রন্থে উদ্ধৃত Mosesএর প্রতি ঈশ্বরের বাণীতেও আছে: "Pharaohএর জন্য আমি তোমাকে 'এলাহ্' নিযুক্ত করেছি।" Psalms of Davidএর ৮২ সংখ্যক স্তবে আছে: "ঈশ্বর 'এলাহ' অর্থাৎ দেবদূত পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন।"

Torah গ্রন্থে দেববিগ্রহগুলিকে 'বৈদেশিক দেবতা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা, কোনও মূর্তিকে প্রণাম করা, এমন কি তার উল্লেখ বা কল্পনা করা যদি এমন কঠিনভাবে বারণ করা না থাক্ত তাহলে ঐ বাক্য থেকে অনুমান করা চল্ত যে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বৈদেশিক দেবতাদের পূজা, হিব্রু দেবতাদের নয়। Palestineএর চতুর্দিকে যে সব জাতি বাস করত তারা গ্রীক দেবতাদের মূর্তি উপাসনা করত আর ইস্রাইল পুত্ররা নিয়ত-ই আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে Baal ও Ashtoroth (অর্থাৎ Venus) এর মূর্ত্তি পূজায় প্রবৃত্ত হোত।

দেখা যাচ্ছে, হিব্রুরা রাজ্যপ্রাপ্তির মত ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তি বা "তাআল্লাহ" (تاله) বাক্যটি ফেরেস্তা ও ঐশী শক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা সম্পর্কেই ব্যবহার করত আর উপমাচ্ছলে ঐসব জীবাত্মার কল্পিত প্রতিমূর্তি এবং রূপক হিসাবে, রাজা ও অনুরূপ কীর্তিমান ব্যক্তিদের প্রতিও শব্দটি প্রয়োগ করত।

এই রকম পিতা ও পুত্র শব্দটির প্রয়োগরীতি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে (আল্লার সম্বন্ধে) ইসলাম এ দুটি শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করে না, কেননা আরবীতে 'সন্তান' ও 'পুত্র' প্রায় সমার্থবাচক: জনক জননীর দেহজ সন্তান বা শারীরিক জন্মসংক্রান্ত কোনও কিছুই আল্লাহ্‌র বা জগৎ পিতার অর্থে প্রযুক্ত হতে পারেনা। অন্যান্য ভাষায় অবশ্য শব্দ দুটির আরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়; সেসব ভাষায় 'পিতা' সম্বোধন 'মহাশয়' সম্বোধনের-ই সমান। খৃষ্টানদের মধ্যে এ শব্দ দুটির বহুলব্যবহার সুবিদিত: এমন কি সম্বোধন-কালে কেউ যদি শব্দ দুটি ব্যবহার না করে তাকে প্রায় সমাজত্যাগী মনে করা হয়। পুত্র শব্দটি বিশেষ করে যীশুর জন্যই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ঐ এক অর্থেই শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। অন্যের প্রতিও পুত্র শব্দ ব্যবহার করা চলে। যীশু-ই তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলতে বলেছেন: 'স্বর্গচারী হে আমাদের পিতা'। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিজের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ

দিচ্ছেন এই বলে যে তিনি তাঁর ও তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হতে যাচ্ছেন। অধিকাংশ উক্তিতেই যেখানে তিনি পুত্র শব্দটি নিজের উপর প্রয়োগ করেছেন সেখানে তার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে তিনি মানবসন্তান।

শুধু খৃষ্টানরাই নয়, ইহুদীদেরও এই রকম বাক্যরীতি আছে। ওদের রাজন্য খণ্ডে (Book of Kings) আছে যে আল্লাহ দাউদকে তাঁর উরিয়ার স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং ঐ 'নারী'র গর্ভে তাঁকে অন্য সন্তান দান করে সেই সন্তানকে নিজ পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিবলেই দাউদপুত্র সুলেমানকে ঈশ্বর পুত্র বলা যদি হিব্রু ভাষায় শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পোষ্যপুত্র গ্রহণকারী অর্থাৎ ঈশ্বরকে পিতা বলাও অশুদ্ধ হবে না।

Manicheanদের ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্ত ধর্মসমাজের মধ্যে খৃষ্টানদের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে। তাঁর 'সঞ্জীবনী কোষ' (كنز الأحياء) নামক ধর্মগ্রন্থে মানী কতকটা এইরূপ উক্তি করেছেন: "সূর্যচন্দ্রের সৈন্য সামন্তরা কুমারী, তরুণী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভগ্নী ও ভ্রাতা নামে অভিহিত হবে, কারণ প্রেরিত গ্রন্থমাত্রেই এই রীতি দেখা যায়। আনন্দের দেশে পুরুষ নাই, স্ত্রী নাই, জননেন্দ্রিয়ও নাই; সবারই সজীব দেহ, কিন্তু যেহেতু সবাই ঐশ্বরিক দেহসম্পন্ন, সেহেতু অক্ষমতায় ও শক্তিতে, দৈর্ঘ্যে ও ক্ষুদ্রতায়, আকৃতি ও রূপে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তারা সবাই একই দীপ থেকে জ্বালানো এবং একই পদার্থে পূর্ব সমাকৃতি প্রদীপের মত। এরূপ নামকরণের আসল কারণ হচ্ছে দুই রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ ও সংগ্রাম। যখন অতল গহ্বর থেকে তামসী শক্তিরা স্ত্রী ও পুরুষের যুগ্ম রূপ ধরে উপরের দিকে উঠে আসতে লাগল তখন জ্যোতির্লোক উর্দ্ধ থেকে তা দেখে নিজ সন্তানদেরকে পুরুষ ও স্ত্রীর বাহ্যিকরূপ দিয়ে তাদের সাথে সংগ্রাম করতে পাঠাল। এমনি করে প্রত্যেক শ্রেণী বিপক্ষদলের সমশ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হোল।"

হিন্দুদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা ঈশ্বরের প্রতি এ ধরণের মানবীয়তা আরোপ করাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ওদের জনসাধারণ ও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তা অতিমাত্রায় করে থাকে। এমনকি, উপরোল্লিখিত বর্ণনাকেও তারা ছাড়িয়ে যায়। এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গর্ভধারণ, প্রসব, ইত্যাদি যাবতীয় শারীরিক

প্রক্রিয়ার সবই ঈশ্বরের সম্বন্ধে কল্পনা করতে তারা সঙ্কোচ বোধ করে না, এবং এসবের বর্ণনাকালে অসঙ্গত ভাষা ব্যবহার করতেও তারা শঙ্কিত হয় না। তবে, সংখ্যায় বেশী হলেও এসব লোকের ধর্মমতকে তেমন কেউ গ্রাহ্য করে না। আসলে ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও বিশ্বাসই হিন্দু ধর্মচেতনার কেন্দ্রস্বরূপ, কারণ ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য এরা বিশেষভাবে নিজকে শিক্ষিত করে থাকে। এই ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও ধারণার কথাই এখন আমরা আলোচনা করব।

যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে এ সমস্তই এক বস্তু। এদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ গীতাতে বাসুদেব বলছেনঃ "সত্য বিচারে দেখা যাবে যে, সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের অংশ, কেননা বিষ্ণু নিজেকে পৃথিবীতে পরিণত করলেন যাতে জীবজন্তু তার উপরে অবস্থান করতে পারে। তিনি নিজে জল হলেন যাতে তাদের পুষ্টি হতে পারে; তিনি অগ্নি ও বায়ু হলেন যার দ্বারা তাদের বৃদ্ধি হতে পারে। তাদের প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডও তিনিই হলেন এবং যেমন বেদে উক্ত হয়েছে, স্মরণশক্তি, জ্ঞান ও তার বিপরীত গুণাবলী, সব তাদেরকে তিনিই দিয়েছেন।"

প্লিনাস (Appollonius)এর 'বস্তুর হেতু' নামক গ্রন্থের উক্তির সাথে এই কথাগুলির কী আশ্চর্য মিল, যেন একে অপরের থেকে নকল করেছে। প্লিনাস বলছেনঃ "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তি আছে যার বলে সমস্ত জড় ও অশরীরী বস্তু বোধগম্য হয়।" ফার্সিতে নিরাকার ঈশ্বরকে খোদা বলা হয়, আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শব্দটি মানুষেও প্রয়োগ করা হয়।

যে সব ভারতীয়রা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের চেয়ে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বেশী পক্ষপাতী, তারা আত্মাকে 'পুরুষ' আখ্যা দেয় (পুরুষের অর্থ মানুষ), কারণ বস্তুজগতের মধ্যে এই আত্মাই একমাত্র জীবন্ত সত্তা। হিন্দুদের মতে, এক জীবন-শক্তি ছাড়া আত্মার অন্য কোনও গুণ নাই; জ্ঞান ও অ-জ্ঞান, পর্যায়ক্রমে এর মধ্যে থাকে; কার্যতঃ সে অ-জ্ঞানী, কিন্তু সম্ভাবনায় সে জ্ঞানী। প্রয়াস বা কর্মের ফলে তার জ্ঞান লাভ হয়; এই অ-জ্ঞানই তার কর্মপ্রয়াসের হেতু, এবং জ্ঞান বা বোধিলাভ এই কর্মপ্রয়াসকে রহিত করে।

'পুরুষের' পরে, ওদের (ভারতবর্ষীয়দের) বিশ্বাসমতে এক মৌলিক নিরাকার সত্তা আছে, যাকে ওরা 'অব্যক্ত' আখ্যা দিয়ে থাকে অর্থাৎ যার

কোন আকার নাই। এটি মৃত জড়পদার্থের ন্যায়, তার কোন কার্যক্ষমতা নাই, তবে তিনটি গুণ আছে। এ গুণগুলির নাম সত্য, রজঃ, তমঃ। শুনেছি, বুদ্ধোধন (?) তার শ্রমণ শিষ্যদেরকে উপদেশ প্রসঙ্গে, এই গুণত্রয়কে "বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ" বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেন এ শব্দগুলি বোধি, ধর্ম ও অজ্ঞানের নামান্তর। প্রথম গুণটি শান্তি ও কল্যাণের, অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিতে যার প্রকাশ; দ্বিতীয়টি শ্রম ও ক্লেশসূচক, স্থিতি ও survival যার বহিঃপ্রকাশ ও তৃতীয় গুণ অবসন্নতা, শ্রান্তি ও প্রত্যয়াভাবের, যার পরিণাম ক্ষয় ও বিনাশ। এই জন্য প্রথম গুণটি দেবতা (ফেরেস্তা)দের, দ্বিতীয়টি মানুষের আর তৃতীয়টি পশুদের প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে। এইসব গুণ ও বস্তুগুলি সম্বন্ধে পূর্বপরের অনুক্রম ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তা আসলে কালবাচক নয়, মর্যাদাসূচক, ভাষার দৈন্যের জন্যই তা করা হয়ে থাকে।

এই ত্রিগুণসম্পন্ন বিভিন্ন আকার ধারণ করে যে সত্তা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তার নাম ওরা দিয়েছে 'ব্যক্ত', অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট। সাকার ও নিরাকার সত্তার সম্মিলিত অবস্থাকে ওরা 'প্রকৃতি' বলে। এই নামটিতে অবশ্য আমাদের কোনও লাভ নাই, কারণ আমরা সূক্ষ্ম নিরাকার সত্তার আলোচনা এখানে করছি না; এ আলোচনায় সত্তা বা পদার্থ শব্দই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কেননা একটি ব্যতিরেকে অন্যটির অস্তিত্ব থাকেনা।

সত্তার (বা পদার্থের) পরে আসে স্বভাব (বা প্রবৃত্তি); তার নাম ওরা দিয়েছে 'অহঙ্কার'। শব্দটি প্রভুত্ব, প্রসরণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা থেকে উদ্ভূত। এ শব্দ প্রয়োগের কারণ হোল এই যে আকার ধারণ করার কালে সত্তা বিভিন্ন বস্তুকে নব নব রূপে বর্দ্ধিত করে, এবং এই বর্দ্ধনের অর্থই হোল অন্য অন্য বস্তুকে পরিবর্তন করে বর্দ্ধিত বস্তুর মধ্যে আত্মসাৎ করা, যেন স্বভাবই অন্য বস্তুগুলিকে পরাভূত, পরিবর্তিত ও করায়ত্ত করছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মিশ্র বস্তুই সেইসব পদার্থের সমষ্টি যাতে বস্তুটিকে পুনরায় বিভক্ত করা যায়। বিশ্বজগতে সামগ্রিক বস্তু হচ্ছে পাঁচটি উপাদান; হিন্দুদের মতে এই পাঁচটি উপাদান হোল ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্, ক্ষিতি। এদের নাম 'মহাভূত' অর্থাৎ প্রবল স্বভাববিশিষ্ট। অন্যান্য জাতিরা যেমন অগ্নিকে ঈশ্বরের তলদেশের উত্তপ্ত শুষ্ক বস্তু মনে করে, হিন্দুরা তেমন মনে করে না।

ধরাপৃষ্ঠে প্রজ্বলিত ধূম থেকে যে সাধারণ শিখার সৃষ্টি হয়, অগ্নি অর্থে ওরা তাকেই বোঝে। যেমন বায়ুপুরাণে উক্ত হয়েছে: আদিতে কেবল ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশ ছিল; ভূমিগর্ভে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ তাকে বাইরে এনে তিন ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ হোল 'পার্থিব' অর্থাৎ সাধারণ অগ্নি যা কাষ্ঠের মাধ্যমে জ্বলে ও জল দ্বারা নির্বাপিত হয়; দ্বিতীয় ভাগ হোল 'দিব্য', অর্থাৎ সূর্য; আর তৃতীয় ভাগ হোল 'বিদ্যুৎ'। সূর্য জলকে আকর্ষণ করে, আর বিদ্যুৎ জলের অন্তরালে চমকিত হয়। জীবজন্তুর দেহের জলীয় অংশের মধ্যেও অগ্নি আছে, জলীয় ভাগ থেকেই সে ইন্ধন পায়, কিন্তু নির্বাপিত হয় না।"

এই উপাদানগুলিও মিশ্র, সেজন্য এগুলিরও প্রাথমিক উপাদানের কল্পনা ওরা করেছে যার নাম দিয়েছে "পঞ্চ মাতৃ" অর্থাৎ পঞ্চ জননী। এগুলিকে ওরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নামে অভিহিত করে থাকে। আকাশের প্রাথমিক সত্ত্ব যেমন 'শব্দ', অর্থাৎ যা শ্রুত হয়। বায়ুর প্রাথমিক সত্ত্ব হচ্ছে 'স্পর্শ', যা স্পৃষ্ট হয়; অগ্নির 'রূপ', যা দৃশ্যমান হয়; জলের প্রাথমিক সত্ত্ব হচ্ছে 'রস' অর্থাৎ যা আস্বাদিত হয়; আর ভূমির সত্ত্ব হচ্ছে 'গন্ধ' অর্থাৎ ঘ্রেয়।

প্রত্যেকটি মহাভূতের সাথে ওরা প্রথমে 'পঞ্চমাতৃ'র এক একটিকে যুক্ত করে, এবং সেই সঙ্গে উপরোল্লিখিত তালিকার ক্রমানুযায়ী তার পূর্ববর্তী মহাভূতের অবশিষ্ট সত্ত্বগুলিও তার সাথে যোগ করে যায়। এই ভাবে, ভূমিতে (যা মহাভূতের উপরোক্ত তালিকার সর্বশেষে আছে) পাঁচটি সত্ত্ব-ই আছে; জলে এক 'গন্ধ' ব্যতীত অন্য চারটি 'মাতৃ' বা উপাদানই বিদ্যমান; অগ্নিতে, 'গন্ধ' ও 'রস' ছাড়া বাকী উপাদানগুলি আছে; বায়ু 'গন্ধ', 'রস' ও 'বর্ণ' (রূপ) ছাড়া অন্য দুইটি গুণের অধিকারী এবং আকাশের 'গন্ধ', 'রস', 'বর্ণ' বা 'স্পর্শ' গুণ নাই, কেবল শব্দ আছে।

আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করে হিন্দুরা কী বোঝাতে চায় আমি জানিনা। তবে অনুমান করি, গ্রীক কবি হোমারের বক্তব্যের সাথে ওদের প্রতিপাদ্যের কিছুটা মিল আছে। "সপ্তস্বরের অধিকারীরা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ও উত্তর প্রত্যুত্তরে রত থাকে।" এই উক্তির দ্বারা তিনি সপ্তগ্রহ-ই বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন অন্য এক কবি বলেছেন: বিভিন্ন সুরবিশিষ্ট সাতটি

গ্রহ আছে যা সমস্তকাল ধরে আবর্তিত হয় আর স্রষ্টার স্তব পাঠ করে, কারণ তিনিই তাদেরকে ধারণ করেন এবং নক্ষত্রহীন মহাশূন্যের প্রত্যন্ত সীমায় তাদেরকে বেষ্টন করে থাকেন।”

গ্রহাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতামত নিয়ে Porphyry যে পুস্তক রচনা করেছেন তাতে লেখা আছেঃ “Pythagorus ও Diogenes যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, নভোমণ্ডলে তাদের চিরনির্দিষ্ট আকার, রূপ ও আশ্চর্য সুরে গ্রহ তারকাদির আবর্তন সেই স্রষ্টার দিকেই ইঙ্গিত করে যার কোনও তুলনা নাই আর কোনও আকারও নাই।” কথিত আছে যে Diogenes এর এমন সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তির গুণে একমাত্র Diogenes-ই গ্রহমণ্ডলীর গতিশব্দ শুনতে পেতেন।

এ সব কথা আসলে সঙ্কেত, বৈজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী যার সরল ব্যাখা করা যায়। এই দার্শনিকদের উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা পূর্ণ সত্যে উপনীত হতে পারেন নি তাদেরই একজন বলেছেনঃ “দর্শনেন্দ্রিয় জলীয়, ঘ্রাণশক্তি আগ্নেয়, ভক্ষণ মৃত্তিকা সম্পর্কিত, আর আত্মার সাথে মিলনের ফলে প্রত্যেক দেহ যা লাভ করে তা হচ্ছে স্পর্শন।”

আমার মনে হয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে তিনি জলের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এইজন্য যে চক্ষুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আর্দ্র পদার্থের কথা তিনি শুনেছিলেন। ঘ্রাণশক্তিকে অগ্নির সাথে যুক্ত করেছেন বোধহয় ধূপ ও ধূমের কারণে আর মাটীর সঙ্গে আহারের সম্বন্ধ অনুমান করেছিলেন বোধহয় এই জন্য যে মাটিই তার সমস্ত খাদ্যবস্তুর উৎপাদন করে। এইভাবে চারটি ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হয়ে গেল, তখন স্পর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে তিনি আত্মার অবতারণা করেছেন।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এতক্ষণ পদার্থের যে সব উপাদানের পরিগণন করা গেল তার যৌগিক রূপ হচ্ছে প্রাণী বা জীব। হিন্দুরা উদ্ভিদকেও একরকম প্রাণী মনে করে। যেমন Plato মনে করতেন যে গাছ পালারও বোধশক্তি আছে কেননা দেখা যায়- যে কোন বস্তুটি ওদের জন্য উপযোগী বা অনুপযোগী বৃক্ষলতা তার প্রভেদ করতে পারে। আর প্রাণীরা ত' ইন্দ্রিয়শক্তির গুণেই প্রাণী।

এই শক্তিকে ‘ইন্দ্রিয়ান’ বলা হয়; কর্ণদ্বারা শ্রবণ, চক্ষুদ্বারা দর্শন নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, আর ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শন হয়।

তারপর আসে ইচ্ছা, যা এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। ইচ্ছার আবাস হৃদয়ে, যার নাম ওরা দিয়েছে 'মন'।

জৈবিক প্রবৃত্তি পাঁচটি আবশ্যকীয় কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, যাকে হিন্দুরা কর্মেন্দ্রিয়ান বলে। পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ হয় আর এই শেষোক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়া ও শিল্প। সেজন্য এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা আবশ্যকীয় আখ্যা দিচ্ছি। এগুলি হোল: বিভিন্ন প্রয়োজন ও ইচ্ছাক্রমে ধ্বনি সৃষ্টি করা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণের জন্য হস্ত সঞ্চালন করা, নিকট বা দূরবর্ত্তী হওয়ার জন্য পদক্ষেপ করা, ভক্ষদ্রব্যের অনাবশ্যক অংশকে শরীরের নির্দ্ধারিত দুইটি রন্ধ্রপথে নিষ্কাশিত করা।

এই হচ্ছে পঁচিশটি পদার্থ বা সত্ত্ব। তাদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ:

১। সামগ্রিক আত্মা।
২। নিরাকার সত্ত্ব।
৩। সাকার পদার্থ।
৪। প্রবল প্রবৃত্তি।
৫—৯। পঞ্চ মাতৃ।
১০—১৪। প্রাথমিক উপাদান।
১৫—১৯। জ্ঞানেন্দ্রিয়।
২০। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক ইচ্ছা।
২১—২৫। জৈবিক কর্মের জন্য নির্দিষ্ট যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়।

এই পঁচিশটি সত্ত্বের সমষ্টির নাম "তত্ত্ব"। সমস্ত জ্ঞান-ই এই 'তত্ত্বে' সীমাবদ্ধ। এইজন্য পরাশর-পুত্র ব্যাস বলেছেন; "এই পঁচিশের সংজ্ঞা, স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ কেবল জিহ্বার দ্বারা পাঠ করেই নয়, ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণিত সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত প্রত্যয়ের মত মনের গভীরে বুঝে নাও। তার পর যে ধর্মে মতি হয় তাই অবলম্বন কর, পরিণামে তোমার মোক্ষলাভ হবেই হবে।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস

সব জাতির মধ্যেই জনসাধারণ ও শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসে পার্থক্য থাকে। কারণ মার্জিত বুদ্ধির লোকের অভ্যাস বিচার বিশ্লেষণ করা এবং

মৌলিক নীতি আবিষ্কার করা, আর সাধারণ লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, ব্যুৎপাদিত বিধান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, খুঁটিয়ে দেখার উৎসাহ পায় না, বিশেষ করে যেসব মতামত ও লক্ষ্য নিয়ে বিরোধ ও সংঘাত বাধে।

আল্লাহ সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস যে তিনি এক, চিরন্তন, অনাদি, অনন্ত, স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, জ্ঞানস্বরূপ, চিরঞ্জীব, জীবনদাতা, সর্বনিয়ন্তা ও সৃষ্টিপালক। তিনি সকল সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের অতীত, তাঁর শক্তির তুলনা তিনিই। কিছুই তাঁর মত নয়, তিনিও কোনও বস্তুর মত নন।

ওদের এই বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার এই উক্তি যাতে নেহাৎ জনশ্রুতি বলে মনে না হয়, সেজন্য এ বিষয়ে ওদের গ্রন্থাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেবো।

'পাতঞ্জল' পুস্তকে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে: "যাঁর উপাসনায় সৌভাগ্য তাঁরই কৃপায় লাভ হয়, সে ঈশ্বর কে?"

গুরু বলেছেন: "তিনি সেই আদি ও অদ্বিতীয় পুরুষ যিনি এমন কোনও কর্মের প্রয়োজন বোধ করেন না, যার প্রতিফল স্বরূপ মানুষকে তার পরম কাম্যরূপ শান্তি বা চরম ভীতির আকর স্বরূপ দুঃখকষ্ট দিতে পারেন। সমস্ত বৈসাদৃশ্য ও তুলনার অতীত বলে তিনি সমস্ত চিন্তারও অতীত। তিনি চিরজ্ঞানী। জ্ঞানী হওয়ার অর্থ যা অজ্ঞাত ছিল তার জ্ঞান লাভ করা; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞানতা আরোপ করা যায় না।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে: "যা বললেন, তাছাড়া কি তাঁর অন্য কোনও গুণ নাই?" উত্তরে গুরু বললেন: "ভাবার্থে তিনি সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত, সর্বপ্রকার স্থানিক অস্তিত্ব থেকে তিনি মুক্ত। সমস্ত বস্তু যাকে একান্তভাবে কামনা করে তিনি সেই পরম কল্যাণ। তিনি ভ্রান্তি ও অজ্ঞতাবিমুক্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা।"

শিষ্য প্রশ্ন করে: "তাঁকে বাক্‌শক্তির অধিকারী মনে করেন কিনা?"

"যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, সেহেতু বাক্যগুণ তাঁর আছেই।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে: "জ্ঞান আছে বলেই যদি তিনি সবাক, তাহলে তাঁর আর জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, যারা তাঁদের জ্ঞানের সংবাদ দিয়ে থাকেন?"

"প্রভেদ হচ্ছে কালের। কিছুকাল অজ্ঞ ও নির্বাক থাকার পর তাঁরা তাদের আহৃত জ্ঞানের সংবাদ অন্যদের কাছে বাক্যে প্রকাশ করেছেন। কাজেই তাদের জ্ঞান আহরণ ও কথায় প্রকাশ এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। যেহেতু ঐশ্বরিক ব্যাপারের সঙ্গে কাল বা সময়ের কোনও বাঁধন নাই সেহেতু ঈশ্বর চিরকালই সর্বজ্ঞ ও সবাক। তিনিই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য আদি পুরুষদের সঙ্গে নানাভাবে কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কাউকে তিনি গ্রন্থ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাঁর সাথে যোগস্থাপনের জন্য কাউকে তিনি দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আবার কাউকে ধ্যান ও চিন্তার দ্বারা তাঁর কৃপা লাভ করার প্রেরণা দিয়েছেন।"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করে: "এই জ্ঞান তাঁর কোথা থেকে আসে?"

"অনন্তকাল ধরে তাঁর জ্ঞান আছে, এবং যেহেতু কখনও তিনি অ-জ্ঞানী নন, সেহেতু তিনিই জ্ঞান। যা তাঁর নাই, এমন কোন জ্ঞান তাঁকে আহরণ করতে হয় না। যেমন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত বেদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রশংসা ও অর্চনা কর তাঁর, যিনি বেদ মন্ত্র ব্যক্ত করেছেন এবং বেদ সৃষ্টির পূর্বেও যাঁর অস্তিত্ব ছিল"।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে: "যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন তাঁকে কেমন করে পূজা করেন?"

গুরু উত্তর দেন: "নামেই তাঁর অনন্যতা সপ্রমাণ হয়, কারণ যেমন তথ্য বা ঘটনা থামলেই তবে তার সংবাদ হতে পারে, তেমনই নামের ধারক থাকলেই তবে নাম থাকতে পারে যদিচ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও অপ্রত্যক্ষ। তাঁকে আত্মাই উপলব্ধি করতে পারে এবং ধ্যান ও চিন্তাই তাঁর গুণাবলীর ধারণা করতে পারে। এই উপলব্ধি ও ধ্যানই তাঁর প্রকৃত উপাসনা এবং নিবিষ্ট-চিত্ত অবিরাম উপাসনার দ্বারাই পরম কল্যাণ লাভ করা যায়।"

এই সুবিখ্যাত পুস্তকটিতে হিন্দুদের বিশ্বাসের কথা যা বলা হয়েছে তা এই।

'ভারত' গ্রন্থের 'গীতা' নামক অংশে বাসুদেব ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে: "আমিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু-বিহীন অনাদি, অনন্ত; আমার কর্মের কোন প্রতিফল আমার অন্বিষ্ট নয়; সৃষ্ট জীবের অন্যেতর কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত আমি নই, কোন বিশেষ শ্রেণী আমার বিরাগ বা প্রীতি ভাজন-ও নয়। আমার সৃষ্ট সকল জীবকেই তার আবশ্যকমত কর্মক্ষমতা দিয়েছি।

অতএব আমার এই গুণদ্বারা যে আমাকে চেনে এবং কর্মফলের লোভ ত্যাগ করে যে আমার মত হবার সাধনা করে তার বন্ধন শিথিল হয় আর পরিত্রাণ ও মুক্তি সহজ হয়।"

দর্শনের সংজ্ঞা হিসাবে যা বলা হয়েছে, বাসুদেবের উপরোক্ত উক্তি অনেকটা তারই সমার্থক: "সাধ্যমত ঐশ্বরিক গুণের নিকটবর্তী হওয়াকে দর্শন বলে।"

এই পুস্তকে বাসুদেব আরও বলেছেন: "অনেক লোক সাংসারিক অভাব মোচনের লোভেই ভগবানের স্মরণ নেয়। তাদের অবস্থা বিচার করে দেখলে দেখতে পাবে যে সত্য ভগবত-জ্ঞান থেকে তারা বহু দূরে আছে, কারণ ভগবান প্রত্যেকের কাছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভাবে প্রত্যক্ষ নন, সেইজন্য তারা তাঁকে জানতে পারে না। কেউ কেউ এমন আছে যার জ্ঞান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; আবার এমন অনেকে আছে যারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অতিক্রম করতে পারলেও, প্রাকৃতিক তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেই ক্ষান্ত হয়। তারা জানে না যে তারও ওপরে আছেন তিনি, যাঁর ঔরসে কেউ জন্মায় না, যিনি কারও ঔরস-জাত নন যাঁর সত্তার ধারণা কোন ব্যক্তির জ্ঞানে বিধৃত হয়নি, আর যাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে।

কর্মের সংজ্ঞা নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈশ্বরকে যারা বিশ্ব-জগতের মূল কারণ বলে মনে করে, তারা সমস্ত কর্মের দায়িত্বও তাঁর উপরে অর্পণ করে, কেননা কারকের অস্তিত্ব যখন তাঁর থেকেই পাওয়া এবং তিনিই যখন সমস্ত কর্মের হেতু তখন কারক তাঁরই কর্মের মাধ্যম মাত্র। অন্য এক দলের মতে, কর্মের মূল ঈশ্বরের সাথে যুক্ত নয়, তাঁর অধস্তন জীবাত্মার সাথে যুক্ত।"

'সাংখ্য' গ্রন্থে সাধক বলছেন: "কর্ম ও কারক সম্বন্ধে মতভেদ আছে কি না?"

ঋষি বলছেন: "একদল বলে আত্মা নিষ্ক্রিয় আর পদার্থ বা বস্তু নির্জীব। স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর এই দুটিকে যুক্ত বা বিযুক্ত করেন, সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই কারক। এ দুটি বস্তুর কর্মক্ষমতা তাঁর কাছ থেকেই আসে, যেমন সজীব শক্তি অক্ষম ও নির্জীব বস্তুকে সঞ্চালিত করে। অন্যেরা কিন্তু বলে: এ দুটির মধ্যে যোগ স্থাপন আসলে প্রকৃতিই করে থাকে কেননা যেসব বস্তু বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিয়মাধীন, তাদের স্বভাবই এই। আবার অন্য এক দল বলে: আত্মাই প্রকৃত কারক, কারণ বেদে উক্ত হয়েছে যে সমস্তই 'পুরুষ' থেকে সমুৎপন্ন।

আবার আর এক দল বলে : কাল-ই আসল কারক, কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মেষ শাবকের ন্যায়, কালের রজ্জুতে কঠিনভাবে বাঁধা, যার দরুন রজ্জুর সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ অনুসারে বিশ্ব গতিশীল হয়। আর একদল বলে : কর্ম পূর্বকৃত কর্মের প্রতিফল ছাড়া আর কিছু নয়।

"এ সমস্ত মতই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্মই জড় পদার্থ-সম্পর্কিত, কারণ এই জড় পদার্থই আত্মাকে আবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহণ ও পরিবর্তন করিয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করায়। সেইজন্য পদার্থই (matter) (০১৮) আসল কারক এবং পদার্থগত অন্য যা কিছু আছে তা সবই এই কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। যে সব ক্ষমতার বলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে প্রকার ক্ষমতা তার নাই বলে আত্মা কারক নয়।"

আল্লাহ্ সম্বন্ধে শিক্ষিত হিন্দুদের মত এই। এদের ভাষায় আল্লাহকে 'ঈশ্বর' বলা হয় যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, মঙ্গলময় এবং যিনি প্রতিগ্রহণ না করেই দান করেন। হিন্দুদের মতে ঈশ্বরের ঐক্য…(absolute) অবিমিশ্র এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্যান্য বস্তুগুলি আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও, আসলে তারা একেরই বহু রূপ। তারা আরও মনে করে যে একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই সত্য, কারণ তাঁরই দরুন অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব। 'ঈশ' আছেন, আর কিছু নাই, এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি নাই আর বস্তুজগৎ আছে, এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব।

শিক্ষিত লোক ছেড়ে আমরা হিন্দু জনসাধারণের কথায় এসে দেখতে পাই যে এদের বিশ্বাস ও রীতি নানা ধরণের। তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, যা বীভৎস। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সমাজেই, এমন কি মুসলমান সমাজেও, এরূপ ধারণা কিছু কিছু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় আকৃতি ও প্রবৃত্তি আরোপ (anthrophomorphism), আল্লাহর যথেচ্ছাচারিতায় বিশ্বাস (Jabariyya সম্প্রদায়ের ধর্মমত) কিংবা ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে নিষিদ্ধ মনে করা, এই রকম কিছু কিছু কুরীতি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। জনসাধারণের জন্য রচিত ধর্মসূত্রগুলি স্পষ্ট ও সরল ভাষায় রচিত হওয়া আবশ্যক, তা নাহলে জনসাধারণের বিশ্বাসে কিরূপ ভ্রান্তি জন্মাতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে : কতক হিন্দু মনীষী ঈশ্বরের নিরাকারত্বের উপর জোর দিতে গিয়ে ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন 'বিন্দু' (نقطة)। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই শব্দটির আসল

তাৎপর্য না বুঝে মনে করল যে ঈশ্বর সত্যই বিন্দুর মত ক্ষুদ্রাকৃতি। এই বীভৎস সমীকরণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তারা এমনও বলতে থাকল যে "ঈশ্বর বার আঙ্গুল দীর্ঘ ও দশ আঙ্গুল প্রস্থ।" আল্লাহ্ সমস্ত পরিমাণ ও পরিমাপের ঊর্ধ্বে।

তেমনি, আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বদর্শী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়, আমাদের এই উক্তি থেকে অজ্ঞ জনসাধারণ মনে করতে পারে যে আল্লাহর এই সর্বজ্ঞতা দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয় এবং দর্শন চক্ষু দ্বারাই সম্ভব। যেহেতু এক চক্ষু অপেক্ষা একাধিক চক্ষুর দৃষ্টিক্ষমতা বেশী, সেহেতু তারা ঈশ্বরকে সহস্রাক্ষ বলে বর্ণনা করে, যার আসল অর্থ হল তাঁর সর্বজ্ঞতা।

ইত্যাকার নানা কদর্য ধারণা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে, বিশেষ করে সেইসব শ্রেণীর মধ্যে, জ্ঞান আহরণ যাদের জন্য নিষিদ্ধ এবং যাদের কথা পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

জন্মান্তর ও আত্মার বিশ্বপরিক্রমা

কোরানের 'এখলাস্' নামক সুরায় বর্ণিত আল্লাহ্র গুণাবলীতে বিশ্বাসস্থাপন যেমন মুসলমান ধর্মের লক্ষণ, ত্রিত্ববাদ বা Trinityতে বিশ্বাস যেমন খৃষ্টান ধর্মের লক্ষণ, আর Sabbath পালন করা যেমন ইহুদী ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস তেমনই হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, সে হিন্দু নয়, তাকে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে গণ্য করে না।

ওরা বলে : আত্মা যতক্ষণ না প্রজ্ঞা লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বকে এক মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে জানার সামর্থ্য তার হয় না। সেজন্য তাকে জগতের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ ও জাগতিক অস্তিত্বের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে পর্যায়ক্রমে অর্জন করতে হয়। এসব অভিজ্ঞতা যদিও গণনা বহির্ভূত নয়, তবুও এর সংখ্যা এত বিরাট যে এক এক করে সেসব অর্জ্জন ও সেসব অবস্থা অতিক্রম করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই আত্মাকে বিভিন্ন জীব ও তাদের বিভিন্ন শ্রেণী ও এই শ্রেণীগুলির স্বভাবগত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও তার দরুন নূতন চৈতন্য অর্জন করতে হয়। কিন্তু দেবতা, মানব ও পশু ধর্মের পার্থক্য হেতু আত্মার কর্মেরও পার্থক্য হয়। আর বিশ্বজগৎও অনিয়ন্ত্রিত নয়, কেননা রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় বিশ্ব এক বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত। সুতরাং

অবিনশ্বর আত্মা তার কর্মের সৎ-অসৎ বৈচিত্র্যানুযায়ী বিভিন্ন নশ্বর দেহের মধ্য দিয়ে জন্মান্তরিত হতে থাকে, যাতে আনন্দের মধ্যে বাস করার ফলে আত্মার শ্রেয়োজ্ঞান জাগ্রত হয়ে তার মধ্যে স্বীয় হিতবুদ্ধির কামনা জন্মায়, আর দুঃখ ক্লেশের মধ্যে থাকার ফলে মন্দ ও নিকৃষ্টের প্রতি ঘৃণা ও তাকে পরিহার করার ইচ্ছা জন্মায়।

এই জন্মান্তরের ধারা উর্ধ্বাভিমুখী, তার ব্যতিক্রম হয় না, যদিও উর্ধ্ব ও নিম্ন, উভয়বিধ গতিই সম্ভব। কর্মভেদে উচ্চ বা নীচ স্তরের জীবে জন্ম হয়ে থাকে। কর্মের এই প্রভেদ আবার পূর্বোক্ত ত্রিগুণাত্মক স্বভাবের সমন্বয় ও বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আত্মা ও জড় পদার্থ আপন আপন লক্ষ্যে পরিপূর্ণভাবে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এই জন্মান্তর চলতে থাকে। নিম্নতম লক্ষ্য হল, বাঞ্ছিতরূপ ব্যতীত জড় পদার্থের আর সমস্ত আকৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, আর উচ্চতম লক্ষ্য হ'ল, আত্মার অজ্ঞাতকে জানার বাসনার নিবৃত্তি হওয়া, স্বীয় মহিমার ও অনন্যতার উপলব্ধি এবং জড়গত ইন্দ্রিয়ানুভূতির নশ্বরতাবোধ জন্মাবার ফলে জড় পদার্থের প্রতি নিরাসক্তি জন্মান। আত্মা তখন জড় পদার্থকে ত্যাগ করে এবং তার ফলে সমস্ত যোগ ছিন্ন হয়ে তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। জড় পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা তার নিজ সত্তায় ফিরে যায় এবং জলপাই যেমন বীজ ও ফুলে রূপান্তরিত হয়েও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তেমনি আত্মাও পরম জ্ঞানের আনন্দ, নিজের সত্তায় ফিরে আসার সময়, তার সঙ্গে নিয়ে আসে। তখন জ্ঞানী, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ লুপ্ত হয়ে সব একাকার হয়ে যায়।

এদের গ্রন্থ থেকে এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা এখন আমাদের কর্তব্য। তারই সঙ্গে অন্যান্য জাতিদের চিন্তায়, অনুরূপ ভাব কি পরিমাণে পাওয়া যায়, তাও দেখান আমাদের উচিত।

দুই বিপক্ষ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দণ্ডায়মান, দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে বাসুদেব বলছেন ঃ "তোমার যদি পূর্ব নির্দ্ধারিত বিধিলিপিতে বিশ্বাস থাকে তাহলে জেনো যে শত্রুসৈন্যেরা বা আমরা কেউই মর নই, প্রত্যাগমন ব্যতিরেকে আমরা কেউই পৃথিবী ত্যাগ করব না। আত্মার মৃত্যু নাই, পরিবর্তনও নাই। কেবল দেহের মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মা তার শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য পরিক্রমণ করে। দেহক্ষয়ে তার পরিক্রমণ শেষ হয়, যার পরে আত্মার প্রত্যাবর্তন শুরু হয়।"

তিনি আরও বলছেন ঃ "যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অবিনশ্বর, তার জন্ম বা ক্ষয় নাই, সে মৃত্যু বা নিহত হবার কথা কেমন করে ভাবতে পারে? আত্মা ধ্রুব ও নিত্য; কোন তরবারি তাকে খণ্ডিত করে না, কোন অগ্নি তাকে দহন করে না, কোন জল তাকে নির্বাপিত করে না, কোন বায়ু তাকে বিশুষ্ক করে না। দেহ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য বস্ত্র পরিধান করে. তেমনি দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আত্মা অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। যে আত্মার বিনাশ নাই তার জন্য তোমার শোকার্ত হওয়ার কি কারণ? যদি আত্মা নশ্বর হতো তাহলেও এই অনিত্য নিরর্থক বস্তুর জন্য শোক করা তোমার আরও অনুচিত হবে। আর যদি আত্মার চেয়ে দেহের প্রতি তোমার পক্ষপাত বেশী থাকে, আর তার ক্ষয়ের সম্ভাবনায় তুমি শোকার্ত হয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যুর পর প্রত্যেক প্রাণীই অন্যরূপে ফিরে আসে। এই জীবন ও মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন নয়, জীবনমৃত্যু সেই পরম ঈশ্বরের হাতে, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস এবং যাঁর মধ্যে এ সমস্তই লীন হবে।"

এই কথোপকথন প্রসঙ্গে অর্জুন তাঁকে বললেন ঃ "যে ব্রাহ্মণ সৃষ্টির আদিতে মানবজাতির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাঁর সাথে কেমন করে আপনি এরূপ যুদ্ধ করেন, আপনি এখন আমাদের মধ্যে সেই মানুষেরই একজন হয়ে বাস করছেন, যার জন্ম ও বয়সের বৃত্তান্ত সুবিদিত।" তার উত্তরে বাসুদেব বললেন ঃ "আমাদের উভয়েরই অস্তিত্ব কালের অতীত। কতবার আমরা জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেছি, যখন জীবনের প্রতিক্ষণের পূর্বজ্ঞান আমার ছিল, কিন্তু তোমার কাছে তা ছিল অজ্ঞাত! জগতের কল্যাণের জন্য যখনই আমি আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা করি তখনই আমি দেহ-রূপ ধারণ করি, কেননা মানুষের মধ্যে বাস করার জন্য মানবাকৃতি ভিন্ন গতি নাই।"

একজন রাজা সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে,—রাজার নাম আমার স্মরণ নাই,—যে তার অনুচরদেরকে আদেশ দিয়েছিল, যেন মৃত্যুর পর তার শব এমন স্থানে দাহ করা হয়, যেখানে পূর্বে আর কোন শব দাহ হয় নি। ঐরূপ স্থান খুঁজে না পেয়ে, তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময়ে, সমুদ্রের জলের উপরে দৃশ্যমান এক প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেয়ে, তাদের অন্বিষ্ট স্থান পেয়েছে মনে করে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাসুদেব তখন তাদের বললেন, এই প্রস্তর-খণ্ডের উপর বহুবার এই রাজারই শব দহন করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের

সঙ্কল্পমত কার্য কর, কেননা রাজা তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন. তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

বাসুদেব বলছেন : "মোক্ষের আশায় যে সংসার থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে অথচ এই লক্ষ্যসাধনে যার মন বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার প্রয়াসের জন্য সে পুরস্কৃত হবে, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ তার ইষ্টসিদ্ধি হবে না। সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং তপস্যার উপযোগী দেহ ধারণের যোগ্য হবে।

এই নূতন দেহ থেকে ঈশ্বরানুপ্রেরণায় তার পূর্ব জন্মের অভীষ্টের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার যোগ্যতা হবে এবং মন তার আয়ত্তাধীন হবে। এইভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে ভ্রমণ করে তার আত্মশুদ্ধি হতে থাকবে এবং অবশেষে সে জন্ম-পরম্পরার শৃঙ্খলমুক্ত হবে।"

বাসুদেব আরও বললেন : "জড়দেহ-মুক্ত হলে আত্মা প্রজ্ঞা লাভ করে ; যতক্ষণ দেহ দ্বারা আবৃত থাকে, জড় পদার্থের মালিন্যের কারণে আত্মার অজ্ঞানতা ঘোচে না। সে মনে করে কর্মের সেই-ই কারক এবং জগতের জন্যই জাগতিক কর্ম সাধিত হয়। সেজন্য সে ঐ কর্মে আসক্ত থাকে এবং তার উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ছাপ পড়ে। দেহ ত্যাগ করার পরও তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাদ তাতে থেকে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না। আত্মা তখন ইন্দ্রিয়জগতের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে আর সেখানে ফিরে যেতে চায়। যেহেতু বিভিন্ন দেহের মধ্যে দিয়ে পরিক্রমণ কালে তার পরস্পরবিরোধী পরিবর্তন হতে থাকে, সেহেতু আত্মা মৌলিক ত্রিগুণের (সত্য, রজঃ, তম) প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। তার পক্ষ যখন কর্তিত, তখন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজকে প্রস্তুত করা ব্যতীত আত্মার আর কি উপায় আছে ?"

তিনি আরও বলেছেন : "প্রজ্ঞা যার লাভ হয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ সে ঈশ্বরানুরক্ত এবং ঈশ্বরও তার অনুরাগী। কতবার যে তার মৃত্যু ও কতবার যে জন্ম হয়েছে! সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, প্রত্যেক জন্মে সে পূর্ণতারই একনিষ্ঠ সাধনা করে।"

"বিষ্ণুধর্মে" অশরীরি জীব প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় বলেছেন : "ব্রাহ্মণ, মহাদেব-পুত্র কার্তিকেয়, লক্ষ্মী (যিনি সমুদ্র থেকে অমৃত উত্তোলন করেছিলেন), দক্ষ (মহাদেব যাকে পরাস্ত করেছিলেন) এবং মহাদেবের স্ত্রী উমাদেবী, এঁদের প্রত্যেকেইএই কল্পের মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন এবং এইরকম তাঁরা বহুবার বিদ্যমান থেকেছেন।"

ধূমকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বরাহ মিহির লিখেছেনঃ "ধূমকেতুর আবির্ভাবকালে মানুষ অমঙ্গল আশঙ্কায় এত ভীত হয়ে পড়ে যে বাড়ীঘর ছেড়ে, সন্তান সন্ততির হাত ধরে, বিলাপ করতে করতে আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে থাকে এবং পরস্পরকে বলতে থাকে যে রাজার পাপের জন্য আমাদের এই শাস্তি। অন্যেরা তার উত্তরে বলে, না, এ আমাদেরই পূর্বজন্মের কর্মফল।"

'মানি' ইরান শহর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর, ভারতবর্ষে এসে এখানকার জন্মান্তরবাদকে স্বীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর 'রহস্যগ্রন্থ' নামক পুস্তকে তিনি বলেছেনঃ "যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা জানতেন যে আত্মার বিনাশ নাই; যোনি ভ্রমণ করে আত্মা বিভিন্ন আকৃতিতে, পরিচ্ছেদের ন্যায় নিজকে আবৃত করে; প্রত্যেক জীবদেহের রূপ সে পরিগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক আকৃতির ছাঁচে সে নিজকে গড়ে। যে আত্মা সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং নিজ অস্তিত্বের মূল কারণ যে জানে না, তার পরিণাম সম্বন্ধে শিষ্যেরা খৃষ্টকে প্রশ্ন করলে যীশু বললেন, 'যে নিজ সত্যকে গ্রহণ করে না, সে দুর্বল আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তার শাস্তি নাই।' বিনাশ শব্দে, 'মানি', আত্মার ক্লেশ বোঝাতে চেয়েছেন, তার বিলুপ্তি নয়, কারণ অন্যত্র তিনি বলেছেন সে 'দিসানীয়'দের ধারণা যে মানুষের দেহেই আত্মার উন্নতি ও শুদ্ধিলাভ হয়। ওরা জানেনা যে দেহই আত্মার শত্রু, তার উন্নতির প্রতিবন্ধক, তার কারাগার ও নিদারুণ শাস্তি। যদি এই মানবদেহের অস্তিত্ব সত্য হতো তাহলে তার স্রষ্টা, এ দেহকে ক্ষয় ও বিনষ্ট হতে দিত না এবং গর্ভাশয়ে শুক্রকোষ দ্বারা নিজের বংশ রক্ষা করতে তাকে বাধ্য করত না।"

'পাতঞ্জল' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ "অজ্ঞানতাই আত্মার শৃঙ্খল। এই অজ্ঞানতা পরিবেষ্টিত আত্মা, খোসায় আবৃত তণ্ডুলের ন্যায়। নিজ জন্ম থেকে অন্য তণ্ডুলের জন্ম দেওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী অবস্থায় যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তার পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার ক্ষমতা থাকে; খোসামুক্ত হলে তণ্ডুলের সে যোগ্যতা আর থাকে না; সে তখন স্থায়ীভাবে নির্জীব জড়ে পরিণত হয়। যে সব বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে দিয়ে আত্মা পরিভ্রমণ করে, তাদের বৈচিত্র, তাদের আয়ুষ্কাল ও সুখ দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর আত্মার প্রতিফল নির্ভর করে।"

শিষ্য প্রশ্ন করেঃ "সেই 'আত্মার কি হবে যে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য কর্ম করে তার প্রতিফল ভোগ করতে গিয়ে, অন্য জন্মের দুঃখে জড়িয়ে পড়ে?"

গুরু উত্তর করেন: "সে পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী আনন্দ ও বেদনার মধ্যে বাস করবে, কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করবে।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে: "যদি মানুষ এই জন্মে এমন কর্ম করে, যার প্রতিফল স্বরূপ মনুষ্যেতর জীবদেহে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং দুই জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকায় তার কৃত কর্মের প্রকৃতি সে বিস্মৃত হয়, তাহলে কি হবে?"

গুরু উত্তর করলেন: "আত্মার সাথে সম্পৃক্ত থাকাই কর্মের প্রকৃতি। কারণ কর্ম আত্মারই ইচ্ছার ফল, দেহ তার যন্ত্রমাত্র। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিস্মৃতি নাই, কারণ সেসব ব্যাপার কালের বন্ধনমুক্ত, সময়ের নৈকট্য বা দূরত্ব তাতে প্রযুজ্য হয় না। আত্মার সাথে সংলগ্ন থেকে কর্ম, পরজন্মের উপযোগী আত্মার চরিত্র ও মেজাজ গঠন করে। স্বীয় নির্মলতার গুণে আত্মা তা চিন্তা করে এবং স্মরণে রাখে। কিন্তু যতদিন দেহের সাথে সে যুক্ত থাকে, ততদিন জড় পদার্থের মালিন্য আত্মার আলোককে আচ্ছন্ন করে রাখে। মানুষের ক্ষেত্রেও এই রকম হয়ে থাকে;—জানা বিষয়কে মনে রেখেও মানুষ, পীড়া মস্তিষ্কবিকৃতি বা নেশার প্রভাবে সাময়িকভাবে তা ভুলে যায়। তুমি কি দেখ নাই যে 'দীর্ঘজীবি হও' এই আশীর্বচনে শিশুরা কেমন খুশী হয়, আর 'তোমার মৃত্যু হোক' এই অভিশাপে তারা কি রকম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে? তাদের কাছে এ দুটি ব্যাপারের কি তাৎপর্য থাকতে পারে যদি তারা কর্মফল স্বরূপ জন্মান্তর অতিক্রম কালে জীবনের সুখ ও মৃত্যুর দুঃখ ভোগ না করে থাকে?"

এইরূপ বিশ্বাস পোষণে ইউনানিরাও হিন্দুদের মত ছিল। সক্রেটিস তাঁর Phaedo নামক গ্রন্থে বলেছেন: "প্রাচীনদের কাহিনী থেকে আমাদের মনে পড়ে যে ইহজগৎ থেকে আত্মা Hades এ যায়, সেখান থেকে আবার এখানে আসে। মৃতবস্তু থেকেই জীবের সৃষ্টি হয় এবং বস্তুমাত্রই সচরাচর তার বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয়। কাজেই যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা আসলে জীবিত আছে। Hades এ আমাদের আত্মাগুলি স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, বিষয়ানুযায়ী প্রত্যেক আত্মাই সুখী বা দুঃখী হয় এবং সেই বিষয়টির চিন্তা করে। এই সংবেদনশীলতা আত্মাকে দেহের সাথে যুক্ত করে রাখে এবং উভয়কে একত্রে গ্রথিত করে, শারীর রূপ দেয়। যে আত্মা বিশুদ্ধ নয় সে Hades এ যেতে

পারে না; দেহ প্রকৃতির স্বভাব পরিপূর্ণ অবস্থাতে সে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং অনতিবিলম্বে অন্য দেহে পতিত হয়ে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মত তাতেই সংলগ্ন হয়ে থাকে। সেইজন্য অনন্য ও পূত ভগবৎ সত্তার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য তার হয় না।"

সক্রেটিস আরও বলেছেন: "আমাদের আত্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে তাহলে আমাদের বর্তমান জ্ঞান, পূর্বার্জিত জ্ঞানেরই স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ মানবরূপ ধারণের পূর্বে, আত্মা অন্যত্র ছিল। শৈশবে যে বস্তুর ব্যবহারে মানুষ অভ্যস্ত হয়, সেই বস্তু পুনরায় দেখলে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে, যেমন মানুষ খঞ্জনি বা করতাল দেখলে, তার শৈশবে যে অজ্ঞাতনামা ছেলেটি এই যন্ত্র বাজাত তার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার নামই বিস্মৃতি, আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বলব্ধ জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবের নাম সংজ্ঞান।"

Proclus বলেছেন: "স্মরণ ও বিস্মরণ বিচারশক্তিসম্পন্ন আত্মার বৈশিষ্ট্য। আত্মা যে শাশ্বত তা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং এ কথাও মানতে হয় যে আত্মা চিরকালই সজ্ঞান ও অজ্ঞান; দেহ থেকে পৃথক থাকা কালে সে জ্ঞানী আর দেহের সন্নিকট হবার কালে সে অজ্ঞানী। কারণ অ-দেহী অবস্থায় আত্মা চৈতন্য লোকের অংশ আর সেইজন্যে সে জ্ঞানী; দেহ সংস্পর্শে আত্মা অধোগামী হয় আর তখন অন্য শক্তির প্রভাবে তাতে বিস্মৃতি ছেয়ে যায়।"

যেসব সুফীরা বলে যে ইহজগৎ হচ্ছে আত্মার ঘুমন্ত অবস্থা, আর পরলোক জাগৃতির, আর সেই সঙ্গে আকাশ, আরশ, কুর্‌শী ইত্যাদির মত স্থান বিশেষে আল্লাহর মূর্ত সবতরণ (incarnation of God) যারা স্বীকার করে, তারাও এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে। অবশ্য এমন সুফীও আছে যাদের মতে পশু, বৃক্ষ, জড়পদার্থ প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ, যাকে তারা ঈশ্বরের সামগ্রিক প্রকাশ বলে থাকে। এই তত্ত্বে যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তাদের কাছে বিভিন্ন জীবদেহে আত্মার বিচরণ করার কোন অর্থই থাকে না।*

---

* হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত আবু রায়হান আলবেরুনীর 'তাহ্‌কিক্ মা লিল্ হিন্দ্' নামক আরবী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের অংশবিশেষের অনুবাদ।